পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চা ঃ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক (২০০১-২০১০)

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর পর থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির হাত ধরে এগিয়ে চলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা চর্চা। ২০০১ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ঘিরে নানা ভাবনাচিন্তা সমৃদ্ধ গ্রন্থ, সে গুলিতে পূর্ব প্রকাশিত নানা তথ্যই অনেকে পরিবেশন করেছেন নিজস্ব আঙ্গিকে আর কিছু রচনায় পাওয়া যায় নতুন ভাবনার ফসল। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, গবেষকদের প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে অন্বেষণ করা হবে তাঁদের ভাবনার আলোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা দিককে। রবীন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব বিলুপ্তির লগ্নে ও পরে রাবীন্দ্রিক ধারাতেই বয়ে চলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা আর চিন্তা-চর্চা। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতেও এই সুরটিই উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত হল ভাবসম্পদ ও সুরবৈচিত্র্যে অনুপম শিল্প, আর এই স্বীকৃতির শংসাধারা বিভিন্ন লেখনীগুলিতে প্রতিভাত হয়েছে।

।। এক।।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর ‘রাগরাগিনীর এলাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। গ্রন্থের ভূমিকাটি সঙ্গীতজ্ঞ

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে শোভিত। গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে— রবীন্দ্রনাথের রাগ-অনুরাগ, রাগ-পরিচয়, সুর বিশ্লেষণ, পরিশিষ্ট, সহায়ক গ্রন্থাদি।

লেখকের আলোচনায় উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহাওয়ায় সংগীতাগ্রহের কথা। রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিশিষ্ট পরিবারে জন্মেছিলেন যেখানে জন্মসূত্রেই মুখের ভাষার মতোই গানকেও প্রায় সহজ সূত্রেই অর্জন করেছেন, গান তাঁর কাছে পোশাকি অলংকরণ মাত্র ছিল না, ছিল দেহলগ্ন লাবণ্যের মতো। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে ঠাকুরবাড়িতে গান রচনার জোয়ারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু না কিছু গান রচনা করেছেন। ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ-খেয়ালাদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার অন্যতম কারণ হল ঠাকুরবাড়িতে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিক্ষকের নিযুক্তি। এ ক্ষেত্রে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মেছেন তখন ঠাকুর পরিবার কলকাতার সাধারণ হিন্দু জনসমাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তার স্থান অনেকটা অন্ত্যেবাসী ব্রাত্যের মতন ছিল। এ কারণেই তৎকালীন কলকাতার তথা সাধারণ বঙ্গসমাজের রুচি এবং সঙ্গীতাগ্রহের সংগে ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতির রুচি ও বোধের কিছু পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কবিগান-যাত্রা-নাটকাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও বিষ্ণু চক্রবর্তী ও অন্যান্যদের ধ্রুপদসঙ্গীতই তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল এবং পরে এ সবই তাঁর আপন সৃষ্টির ভাণ্ডারে প্রধান উপকরণ হয়ে উঠল। তাছাড়া রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতেও রাগসঙ্গীতের প্রাধান্য অথচ অলংকরণমুক্ততা রবীন্দ্রনাথকে রাগের অনুরাগী করে তুলতে সাহায্য করেছে।

লেখকের মতে, ঠাকুর পরিবারে অন্যান্যরা যে সব গান রচনা করেছেন তার মধ্যে রাগসঙ্গীতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের

পূর্বেই রাগসঙ্গীত থেকে ভাঙা গানের খোঁজ পাওয়া যায়। এই গান ভাঙার ক্ষেত্রেও সকলে মূল গানের সুরটুকুই গ্রহণ করেছেন, কথা, আলাপ বা তান করেছেন বর্জন। গানগুলি প্রায় সবই শান্তরসের পূজা উপযোগী লয়ে ও ছন্দে রচিত হয়েছে, গানগুলি ধ্রুপদ বা খেয়াল না হয়ে ধ্রুপদাঙ্গ বা খেয়ালাঙ্গ বাংলা ভাঙা গান হিসেবে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রভাব প্রসঙ্গে গবেষক বলেন,

> ''ভাঙা গানের মধ্যে বিষ্ণুপুরের প্রচুর গানের প্রভাব থাকলেও অন্য ঘরানার গানও তিনি ভেঙেছেন। ঠাকুর বাড়িতে যাঁরাই শিক্ষক হিসেবে বা সাধারণ সাংগীতিক সূত্রে জড়িত ছিলেন তাঁরা সবাই ষোলো আনা বিষ্ণুপুরী ছিলেন না। এমনকী রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় আদর্শ যদুভট্টকেও পুরোপুরি বিষ্ণুপুরী বলা যায় না। যদুভট্ট কিশোর বয়সেই বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে অন্যান্য স্থানে গিয়ে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা নিশ্চয়ই বিষ্ণুপুরী নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের কিছু বিশিষ্টতা যা বিষ্ণুপুরী বলে অনুমিত হয় তা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আছে।''[১]

রাগসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে এর প্রয়োগ নিয়ে লেখকের অভিমত হল,

> ''রাগ নিয়ম মানা ও ভাঙার ব্যাপারে তাঁর নিয়ামক ছিল তাঁর স্মৃতি বা বিস্মৃতি এবং তাঁর সঙ্গীত দর্শণ - 'ভাবপ্রকাশ'। ভাব প্রকাশের কারণে তিনি প্রয়োজনে ব্যাকরণ-বর্জিত স্বর ব্যবহার করতেন।.... রাগ-রাগিনীর রসগত দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানগুলিতে তিনি ভাবকে রসমূর্তি দিয়েছেন। তিনি রাগ-রাগিনীর

উপকরণগুলিকে, সুরের ফালিগুলিকে, জীবন্ত প্রাণরসের মূর্তিরচনার কাছে লাগিয়ে অমৃতসৃষ্টি করেছেন।... রবীন্দ্রনাথের তিন মিনিটের এক একটি গানের ভিতর তাঁর যে সব ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা এ সব রাগ-রাগিনীর স্পর্শে রসমূর্তি ধরে বিকশিত হয়েছে। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক একটি ভাব রাগ-রাগিনীর স্পর্শে ব্যক্তির বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে অকূল অসীমের দিকে প্রসারিত হয়েছে।...এ রসানন্দ মানুষকে শোক-দুঃখ-ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম, স্বস্তি ও আনন্দের পথে নিয়ে যায়— নিয়ে যায় ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, সেটাই বৈকুণ্ঠ।"[২]

রাগ-রাগিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তির উল্লেখে লেখক রবীন্দ্রনাথের রাগানুরাগে লক্ষ করেন যে এই রাগ-অনুরাগ যে কী গভীর ও ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রজীবন ও জীবনবোধকে ধারণ করে আছে, তা যে কেবল তাঁর সংগীত চর্চার ইতিহাসেই পাওয়া যায় তা নয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বদর্শন, সৃষ্টিকর্ম সব কিছুকেই তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে যথার্থ 'রঞ্জনা' শব্দটির গভীর রূঢ় অর্থটিকেই কবি অনুভব করেছেন সুরের মধ্যে, রাগের মধ্যে।

"তাঁর মহৎ আদর্শ-প্রচারক চরিত্রগুলির সঙ্গে রয়েছে গান বা রাগ। তাঁর রচনায় যেমন আছে গায়ক বাউল, ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুর্দা প্রভৃতি— তেমনি আছে নানা পরিবেশ এবং ঘটনার প্রকাশে— অনুকূল রাগের উল্লেখ। 'বউ ঠাকুরানীর হাট'-এ রয়েছেন বসন্ত রায়, যিনি রাজকার্যের চেয়ে গানকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে

সেতার, কণ্ঠে আছে গান। তাঁর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করেছেন। ...'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে অক্ষয়ের কণ্ঠে গান যেন সংলাপ হয়ে উঠেছে। তার প্রসঙ্গে তিনি ঝিঁঝিট, কালেংড়া, সিন্ধু-ভৈরবী, খাম্বাজ, ভৈরবী, সিন্ধু, পরজ, কাফি, বাহার, পিলু প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। 'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস ও কুমু দুজনেই এসরাজ ও গানকে তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথী করে নিয়েছেন। তাঁদের আহত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূপালী, রামকেলি, কানাড়া, আশাবরী, ভৈরোঁ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কল্পনা' কাব্যের কিছু কবিতার শীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে। যেমন, বিভাস (হতভাগ্যের গান), ভৈরবী (সে আমার জননী রে), সিন্ধু-ভৈরবী (লীলা), মল্লার (নব বিরহ), বেহাগ (কাল্পনিক), আলেয়া (সকরুণা), ঝিঁঝিঁট (বিবাহ মঙ্গল) প্রভৃতি। 'সন্ধ্যা সংগীত' থেকে 'পূরবী', 'সানাই' প্রভৃতি পর্যন্ত তাঁর বহুগ্রন্থের নামকরণে এবং অন্তর্গত কবিতাতে রাগের উল্লেখ আছে।"[৩]

লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথ নানা অনুভবের প্রকাশের জন্যে প্রচলিত পরিচিত রাগ-রাগিনীর বাহনকে আরও বেশি ভার-বহনক্ষম সহনশীল ও নমনীয় করার জন্যে রাগমিশ্রণকেই গ্রহণ করেছেন, কখনো কোনো রাগের সুরে কবি বর্জিত বা বিবাদী আগন্তুক স্বর এনেছেন আবার কখনও একাধিক সম ও বিসমধর্মী রাগের সুরকে যুক্ত করেছেন অনায়াসে। লেখক ভীমপলাসী ও মূলতান, ইমন-পূরবী, ভৈরব-ভৈরবী, তোড়ি-ভৈরবী, কেদারা-ছায়ানট, বেহাগ-খাম্বাজ ইত্যাদি রাগের যুগ্ম ও মিশ্র

প্রয়োগের কিছু উদাহরণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ সহ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন যে এ সব ক্ষেত্রে রাগ ব্যাকরণ-ভ্রষ্ট হলেও সুর রসভ্রষ্ট হয়নি। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী বলেছেন,

> ''যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অতুলনীয়, তাকেই তিনি সঙ্গীতের বা রাগের পটভূমিকায় দেখেছেন— বিশ্বের অন্তর্লীন সৌন্দর্যপ্রবাহকে তিনি জাগতিক বস্তু সমুদয়ের মধ্যে দেখেছেন— যার প্রাণ সঞ্চারে বিশ্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, তাঁর উপস্থিতিকে তিনি রাগ-রাগিনীর মধ্যে অনুভব করেছেন। ... এই হলো রবীন্দ্রনাথের রাগ-অনুরাগ।''[৪]

লেখকের মতে, রাগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, তবে রাগাশ্রিত ধ্রুপদাঙ্গে, খেয়ালাঙ্গে গানের তালের প্রয়োগে চৌতাল, ধামার, ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদিকেই বহাল রেখেছেন, যা আজ অবধি মেনে চলা হয়। তবে ঢালা গান অর্থাৎ তাল ছাড়া গানের বিষয়টিতে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত রীতির বাইরেও এগুলোকে পরিবেশন করা হচ্ছে। তাই গবেষকের স্পষ্ট বক্তব্য হলো,

> ''ঢালা গান অর্থাৎ তালছাড়া গাওয়ার পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব কীর্ত্তনাঙ্গ কথকতা থেকে হয়েছে। ... তাঁর কিছু গানকে নাটকীয়তার রং লাগাতে রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন বলে শুনেছি। কালমৃগয়া-বাল্মীকি প্রতিভার সব গানেই তাল আছে— অবশ্য আজকাল অন্ধমুণি প্রভৃতির গান ঢালা পদ্ধতিতে গাওয়া হচ্ছে। তাঁর এ পদ্ধতি মধ্য বয়সের কিছু গান এবং প্রধানত নাটকের গানে দেখা যায়, যেমন 'তোমায় নতুন করে পাব বলে'।

এখন এই নাটকীয় আমেজ আনার জন্যে অনেক গানই ঢালা পদ্ধতিতে গাওয়া হচ্ছে। ... এ ধরনের গানের ব্যাপারে কোনো censor নেই। একমাত্র গায়ক ও শ্রোতার বিবেকই পারে এ নতুন ধরনের 'ব্যত্যয়' থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাঁচাতে।... আজকাল মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি স্বরবিতানের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগত থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটিকে রবীন্দ্র-ব্যত্যয় বলে মানতে ইচ্ছে করে না।"[৫]

এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত নব্বইটি রাগ নিয়ে রাগের পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ সহ যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। তবে লেখকের মতামত হল যে এই নব্বইটি রাগকেই একেবারে চূড়ান্ত সংখ্যা বলে মেনে নেওয়া যাবে না। তাঁর মতে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন শৈলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রুচি ও পক্ষপাত ধ্রুপদের দিকে, ধ্রুপদের পরেই অবশ্য বন্দেশ ভাঙার দিক থেকে রয়েছে খেয়ালের অবস্থান। সাধারণত, রাগসঙ্গীতে ধ্রুপদের চারটি কলি এবং খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরিতে দুটি করে কলি থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাঙা গানে প্রায় সর্বত্র মূলের এই কাঠামো রক্ষা করলেও ব্যতিক্রমও আছে। লেখকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। লেখকের মতে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী যথার্থই ধ্রুপদের আলাপ এবং বন্দেশ-এর সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে এবং আরো উন্নত, আরো সম্পন্ন করেছে। প্রত্যেকটি গানের মধ্যকলি বা সঞ্চারীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাস্থিত ভাবটিকে যে ভাবে সঞ্চারিত করেছেন তা অন্য কোনও গানে বা গীতরূপে পাওয়া যায় না। লেখকের গবেষণা থেকে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরযুক্ত গান অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরসন্ধানযুক্ত গান সংখ্যা 'কমবেশি ১৯৭৫টি'। এর মধ্যে নানা ধরনের ভাঙা গানের সংখ্যা '২৫০-এর মতো' ; আর রাগসঙ্গীতের বন্দেশভাঙা

(ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি) গান '২২৫-এর কাছাকাছি'। এই গ্রন্থে লেখক সুর বিশ্লেষণে ২৩০টি গানের দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপিত করে উক্ত ভাঙা গানের সংখা নিরূপণ করেছেন। যা অপরিসীম শ্রমসাধ্য ব্যাপার। গ্রন্থের পরিশিষ্টে অল্প কয়েকটি মূল গানের (যে গুলো থেকে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন) স্বরলিপি বিভিন্ন পদ্ধতির স্বরলিপিতে মুদ্রিত রয়েছে তা গ্রন্থভুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন গবেষক। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় ও গবেষণায় রাগাশ্রিত গানের তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণে গ্রন্থটি একটি আদর্শ সহায়ক গ্রন্থ। তাঁর কাছে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হয়।

।। দুই।।

সুভাষ চৌধুরী-র 'গীতবিতানের জগৎ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমরা যে গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করেছি তা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রকাশিত সংস্করণ। গ্রন্থসূচিতে রয়েছে— লেখকের ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন, প্রকাশের ইতিহাস (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড), গীতবিতান দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড), নতুন সংস্করণ গীতবিতানের বিন্যাস, গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (প্রকাশ ঞ্জ আশ্বিন, ১৩৫৭), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (সংস্করণ ঞ্জ ভাদ্র, ১৩৬৪), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ ঞ্জ শ্রাবণ ১৩৬৭), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ ঞ্জ ভাদ্র ১৩৭১), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ ঞ্জ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৬), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ ঞ্জ মাঘ ১৩৭৯), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড প্রস্তাবিত ষষ্ঠ সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা, গানের পাঠভেদ, গান-এর শিরোনাম, রবীন্দ্রনাথের গীতসংকলন গ্রন্থে রাগ-রাগিনী, স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্রিকাধৃত গানের রাগ ও তাল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল, কলিগঠন, কলিগঠনের বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতে উপাদান আর প্রকাশ, মুক্তছন্দের গান, কবিতা থেকে গান, গান থেকে কবিতা, গানে সঙ্গীতে

প্রসঙ্গ।

পরিশিষ্ট — অপর-কৃত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গান, কয়েকটি তথ্য, গৎ ভাঙা গান, ইংরেজি গান, রবীন্দ্রনাথ-অনুদিত গান।

৭৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'গীতবিতানের জগৎ' গ্রন্থটিকে বিষয়গত বৈচিত্র্যে তিন থেকে চারটি গ্রন্থের মিলিত সংস্করণ বলা চলে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আকর গ্রন্থ 'গীতবিতান' প্রকাশ পাবার ঘটনা, আর তিনটি খণ্ডে বিভক্ত গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ থেকে পরবর্তী সংস্করণে অদলবদলের ইতিহাস ধরা রয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সুভাষ চৌধুরী আপন বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। স্বভাবতই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের নানা ধরনের ভাবনা-চিন্তা আর অভিজ্ঞতার ফসল এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত। গীতবিতানের গানের কথা-সুর-তাল নিয়ে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতিতে যাওয়া যায় বলতে গেলে তার সবটাই দীর্ঘ তালিকায় তথ্যবদ্ধ করে পরিবেশন করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের গান 'গীতবিতান'-এ প্রকাশিত হবার পূর্বে তাঁর নিজস্ব অন্যান্য গীতিসংকলন, কাব্যগ্রন্থাবলী, নাটক ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন,

> "১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'রবীন্দ্রঙ্গীতে'র আকর গ্রন্থ 'গীতবিতান' আত্মপ্রকাশের পূর্বে তেরোটি গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাঁর 'সমুদয়' গান। এই গ্রন্থ ত্রয়োদশের আদিমতটি প্রকাশিত হয় ১২৯২ সনে কবি অনুরাগী যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের আগ্রহাতিশয্যে 'রবিচ্ছায়া' নামে আর শেষতমটি প্রকাশিত হয় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'গীতিচর্চা' নামে পৌষ ১৩৩২ সনে।"[৬]

লেখকের গবেষণায় জানা যায় যে গীতবিতানের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম

সংস্করণ (আশ্বিন ১৩৩৮) ও তৃতীয় খণ্ডের (শ্রাবণ ১৩৩৯) প্রথম সংস্করণ মিলে সর্বমোট ১৪৮৫টি গান তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। গীতবিতান-এর দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে লেখকের মতামত হল,

> ''প্রথম সংস্করণ 'গীতবিতান' প্রকাশিত হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন একটি অভাব— তা হল গ্রন্থটির 'ব্যবহার যোগ্যতা'। সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল— মনের মধ্যে চলছিল নানান পরিকল্পনা। তাঁর নিজের ব্যবহৃত গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ দেখলেই এই বিশ্বাসের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুনর্বিন্যাসের কথা ভেবে সূচিপত্রে গানের প্রথম ছত্রের পাশে ১, ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। কখনো বা গান একেবারে বাতিল করে দিচ্ছেন। কোনো কোনো গানের পাশে দেখা যায় অধ্যায়-বিন্যাসের নামকরণ।''[৭]

তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতান প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ নতুন রূপে রবীন্দ্র প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে কানাই সামন্তের সম্পাদনায়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা নিরূপণে লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচির সঙ্গে তার অমিল দেখিয়েছেন। তাঁর অভিমত হলো,

> ''সংখ্যা নির্ণয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই কাজটি অবশ্যই প্রাথমিক একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় এই গ্রন্থে গান বলে যা চিহ্নিত হয়েছে

তার কিছু অংশ স্বতন্ত্র গান হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না— সেগুলি গান নয়, সুরে সংলাপ। এ ছাড়া গানের সংখ্যা নির্ণয়ে রয়েছে আরো নানা সমস্যা— যেমন একই গানের ভিন্ন সুর, সামান্য ও বিস্তর পাঠান্তর, ছন্দান্তর।"[৮]

লেখক কতগুলি শর্ত নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রগানের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। শর্তগুলি হলো—

" (১) গানে স্থায়ীর সঙ্গে অন্তরা থাকতে হবে। (২) স্থায়ী অন্তরা থাকলেই হবে না— স্বতন্ত্র গান হিসেবে তা গীত হবার যোগ্য হতে হবে। (৩) যে সব গানের সুর সংগৃহীত হয়নি তা অবশ্যই সংখ্যাভুক্ত হবে। (৪) দুটি-একটি শব্দের পরিবর্তনকে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গণ্য করা হয়নি। তবে স্বতন্ত্রভাবে গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।"[৯]

এভাবে শর্তসাপেক্ষে সুভাষ চৌধুরী এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মোট সংখ্যা দেখিয়েছেন ১৯১৫টি। এই গ্রন্থে গানের পাঠভেদের উল্লেখ করতে গিয়ে কেবলমাত্র গীতবিতানের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও প্রচলিত সংস্করণের পাঠভেদ সংকলন করেছেন লেখক এবং গীতবিতানভুক্ত গান, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলির সঙ্গে প্রচলিত গীতবিতানের পাঠভেদের দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপিত করেছেন। গীতবিতানভুক্ত গান শিরোনাম সহ যে সব রবীন্দ্রগ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে, তারই তালিকা লেখক এই গ্রন্থের গানের শিরোনাম অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। গীতবিতানভুক্ত গানগুলির রাগ ও তাল নির্দেশ করে লেখক দুটি অধ্যায়ে তালিকা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। 'রবীন্দ্রনাথের গীতগ্রন্থ সংকলনে রাগ-রাগিনী' এই অধ্যায়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কবির

গীতিগ্রন্থগুলো হল, 'রবিচ্ছায়া', 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা', 'কাব্যগ্রন্থাবলী', 'মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ৮ম ভাগ', 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হিতবাদী', গান (১৯০৮), গান (১৯০৯)। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১২টি গানের তালিকা করে উক্ত গানগুলির রবীন্দ্রনাথের অন্য গীতসংকলনে প্রাপ্ত রাগ ও তাল নির্দেশকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া অপর একটি তালিকায় স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্রিকা ধৃত গান রাগ ও তালের দীর্ঘ তালিকা সংশ্লিষ্ট গান সহ উপস্থাপিত করেছেন। এই তালিকার স্বরলিপি গ্রন্থ আর পত্রিকাগুলি হল— 'স্বরলিপি গীতিমালা', 'ব্রহ্ম সংগীত স্বরলিপি (১-৬)', 'গীতলিপি (১-৬)', 'সংগীত গীতাঞ্জলি', 'বীণাবাদিনী', 'সংগীত প্রবেশিকা', 'আনন্দ সঙ্গীত' 'স্বরবিতান (ভাদ্র, ১৩৪২-)। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল' অধ্যায়ে লেখক বিভিন্ন তালযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করেছেন। তাল অধ্যায়ে লেখক স্বরলিপিতে যে সব গান তালবদ্ধ রয়েছে অথচ গানগুলি মুক্তছন্দে তালছাড়া গাওয়ার অন্যরীতিও প্রচলিত, তাও নির্দেশ করেছেন। কলিগঠন অধ্যায়ে প্রাচীন প্রবন্ধগীতির অবতারনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি বিভাগ সম্পর্কে লেখক বলেন,

> ''কলি গঠন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসম্ভার বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই প্রাচীন প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলির বেশ কিছু তাঁর রচনার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে দেখা যাবে— বিশেষ করে সঞ্চারী তুকে। এর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানে সামগ্রিকভাবে কলি গঠনে যে বৈচিত্র্যের সম্ভার তা অভূতপূর্ব। দুই তুক বা চার তুকের গান বাদ দিলে অন্যান্য গানগুলির তুকের প্রচলিত নামকরণে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। ... এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা। বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি নতুন

সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মেচিত করেছেন তিনি।”[১০]

লেখকের মতে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ১/২ (অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা) এবং ১/২/৩/৪ (অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) গঠনের কলিবিভাগ ছাড়া আরো ২৯ প্রকারের কলিগঠন বৈচিত্র্য দেখা যায়। তিনি আরও মনে করেন, উপাদান আর তার প্রকাশের মধ্যে যখন একটা সামঞ্জস্য হয়, তখনই পাওয়া যায় সৃষ্টিকে আর এইরূপ সামঞ্জস্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। লেখকের অভিমত হল,

> ‘‘রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীতসৃষ্টির প্রায় এক দশমাংশ গান রচিত হয়েছে কখনও হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত, কখনও বাংলার লোকসঙ্গীত, কখনও বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত আবার কখনও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আধারে। এই পর্যায়ের গানগুলি একটি সুস্পষ্ট ধারায় বিন্যস্ত যাকে বলা হল ‘ভাঙা গান’। এই সব গান রচনায় কখনও বাণীর লাবণ্য বা শব্দের ঝংকার, কখনও বা সুরের মায়ায়, আবার কখনও বা কেবলই ছন্দের লীলায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, আর সৃষ্টি করেছেন এমন সব গান যার আবেদন চিরন্তন। সেখানে নির্মাণ নয়, সৃষ্টির আনন্দেই মগ্ন যেন স্রষ্টা। এ এক আশ্চর্য রূপান্তরের খেলা যেখানে মূল আধারের সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার যোগসূত্র অনেক ক্ষেত্রে কেবলই তথ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল আধারের সমস্ত বন্ধন ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা।”[১১]

এ প্রসঙ্গে লেখক রবীন্দ্রনাথের ১৩ বছর থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের ২৩৩টি ভাঙা গানের তালিকা মূল গান সহ তুলে ধরেছেন। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে গান-ভাঙার প্রকল্প রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সেই থেমে যায়নি,

তা চলেছে আজীবন। লেখক তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন ভাঙাগানের অধিকাংশই ব্রহ্মসঙ্গীত, যা কোন না কোন উপলক্ষে রচিত, আবার এই ধারাতেই কবি নিতান্ত মনের তাগিদেও গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগানকে মৌলিকতার মূল্যায়নে লেখক নানাভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন (ক) বাণীর হুবহু ভাষান্তর অর্থাৎ আক্ষরিক রূপান্তর, (খ) সুর ও ছন্দের হুবহু অনুসরণ (গ) মূল গানের বাণীর ধ্বনি তরঙ্গের অনুসরণ (ঘ) গানের বহিরঙ্গের কাঠামো অনুসরণ অর্থাৎ কলি বিন্যাসগত দিক থেকে ইত্যাদি। নানা মূলগান সহ সংশ্লিষ্ট ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্লেষণে তিনি উক্ত বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে গ্রন্থমধ্যে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ‘‘রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলির মূল্যায়নে হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য গানের কিছু উপাদানের আভাস পাওয়া যাবে কিন্তু তার প্রকাশে যে সৃজনশীলতা যে সৃষ্টিগুলোর উল্লাস ধরা রইল তা সামঞ্জস্যের এক অন্যতম স্তর-সেখানে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ-অনুরাগের মিল। রসসৃষ্টিতে আসল কথা ‘কেন হল’ এ প্রশ্নের জবাবে নয়, আসল কথা ‘হয়েছে’ এই উপলব্ধিতে।’’[১২]

রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতেই যে রূপটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে তা এই রাগাশ্রিত ভাঙাগানে ততটা বিভাসিত নয়। এখানে রাগসঙ্গীতের সুরের গন্ধটুকু শুধু রয়ে গিয়েছে অথচ তা নিতান্তই অন্যতর স্বাদে উজ্জ্বলতম।

সমালোচক সুভাষ চৌধুরী এই গ্রন্থে মুক্তছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তাঁর ভাবনায় তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন— (ক) গানগুলির স্বরলিপি তালবদ্ধ কিন্তু মুক্তছন্দে গাওয়ার রীতি প্রচলিত, (খ) গানগুলির স্বরলিপি দুটি ভিন্ন ছন্দে তালবদ্ধ কিন্তু মুক্তছন্দে গাওয়ার রীতি প্রচলিত (গ) স্বরলিপি তালবদ্ধ নয় কিন্তু সমমাত্রার

বিভাজনে বিন্যস্ত। মুক্তছন্দের গানের উক্ত বিভাজন ভিত্তিক তালিকায় লেখক বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন। বলেছেন,

> ‘‘রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার (গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য বাদে) অন্তত পাঁচ শতাংশ গান মুক্তছন্দে গাওয়ার রীতি সুপ্রচলিত। মুক্তছন্দের এই গানগুলি ‘তালছাড়া গান’ ‘ঢালা গান’ এমনই নানান নামে চিহ্নিত। ... যদিও এই ধরনের গানের রূপায়ণে একটি অলিখিত স্বাধীনতার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের ক্ষেত্রে যা অকল্পনীয়।... মুক্তছন্দের গানগুলির রূপায়ণ এমন নমনীয় যে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে কেবলই পরিবর্তিত হতে থাকে। ... কোনও বিশেষে পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে কোন বিশেষ কারও কণ্ঠে শোনা সুরের প্রতি দুর্বলতা যতখানি আচ্ছন্ন করে ততখানিই অনীহা দেখা যায় প্রামাণ্য সুরের প্রতি। ... সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে টপ্পার অলংকরণে। ... বাস্তবে হিসাব করে দেখলে দেখা যায় মুক্তছন্দের গানের মধ্যে প্রকৃত অর্থে টপ্পার অলংকরণ সমৃদ্ধ গানের সংখ্যা নিতান্তই কম। ...যে কোনও মুক্তছন্দের গানের যে কোনও শব্দে হিসাবহীন টপ্পার অলংকরণ যুক্ত হয়। এতে গানের বাণী প্রায়সই তার ওজন হারায়। ... সঙ্গত কারণে এ প্রশ্নও এসে পড়ে মুক্তছন্দের গান কি কখনও এক হওয়া সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। রূপায়ণের ক্ষেত্রে পার্থক্য কেবলমাত্র অভিব্যক্তি ও আবেদনে। আর এ ক্ষেত্রে স্বরলিপি অবশ্যই

মুক্তছন্দের উপযোগী হতে হবে।”[১৩]

লেখকের বক্তব্য থেকে উঠে আসে মুক্তছন্দের গানের উপস্থাপনায় একই গান অনেকরকম সুরান্তরে, অলংকরণে এক একজন শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায়। লেখক যথাযথ উদাহরণ দিয়ে শিল্পীদের কথা উল্লেখ করে বিষয়টির অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের প্রামাণিকতা বজায় রাখতে লেখক এই অধ্যায়ে প্রস্তাব রেখেছেন মুক্তছন্দের গানের প্রামাণ্য স্বরলিপি গঠনের জন্য, তাতে করে গানের সুরের মূল কাঠামো সকলের কাছে একভাবে পৌঁছাবে, আর মুক্তছন্দের গানের যথাযথ ভাবরস উপস্থাপনেও সুবিধা হবে। লেখকের মতে, মুক্তছন্দের গানেও ছন্দকে খুঁজে বার করতে হবে শিল্পীকে, ফলে গানের যথার্থ ভাব প্রকাশে সাহায্য হবে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যগ্রন্থের কবিতা কীভাবে কবির আপন খেয়ালে গান হয়ে উঠেছে আর কখনও গান থেকে কীভাবে কাব্যগ্রন্থে কবিতার জন্ম হয়েছে সে বিষয়ে লেখক ‘কবিতা থেকে গান’ ও ‘গান থেকে কবিতা’ অধ্যায় দুটিতে অপূর্বসুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়গুলি যদিও এই গ্রন্থ প্রকাশের বহু পূর্বেই শান্তিদেব ঘোষ, অরুণকুমার বসু প্রমুখের গবেষণার হাত ধরে আমরা জানতে পেরেছি। ‘গানে সঙ্গীত প্রসঙ্গ’ অধ্যায়ে লেখক গীতবিতানের গান থেকে সংগীত বিষয়ক কলি নির্বাচন করে তালিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গানের সাংগীতিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন।

সুভাষ চৌধুরীর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পাওয়া সুচিন্তিত মতামত ও তথ্যপূর্ণ সম্ভার ‘গীতবিতানের জগৎ’ আসলে হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণার একটি আকর গ্রন্থ।

।। তিন।।

ক্ষেত্র গুপ্ত-র 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ শব্দের মন্ত্র' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। গ্রন্থটিকে সূচিপত্রে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—আদিতে 'কৈফিয়ৎ নয়', মধ্যে 'শব্দাবগাহন' (একশটি গানের কবিতারূপে রসাস্বাদন) ও অন্তে-'প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি'।

অনেকেই বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান, সুরের থেকে কথার আধিপত্য সেখানে বেশি। আবার কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়েছে এমন উদাহরণ শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্য কবিদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অনেক সময় তাই মনে প্রশ্ন জাগে, গানকে যদি কেবল না শুনে কবিতা ভেবে পড়ি তবে কেমন হয়? আমাদের যাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে তাদের অবশ্যই সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তর লেখা গ্রন্থটি একবার পড়তে হবে।

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ক্ষেত্র গুপ্ত স্বনামধণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব থেকে পাঠক মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না বলেই এক মুহূর্ত আমাদের থমকাতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এখানে বিষয়—রবীন্দ্র কবিতার গান নয়, রবীন্দ্র গানের কবিতা। গ্রন্থের নিবেদনে লেখক বলেছেন,

> ''কবিতাতে সুর লাগিয়ে যখন গাওয়া হয়, সাহিত্যের পক্ষ থেকে কদাপি আপত্তি ওঠে না। সুর ভুলে যদি গান পড়ি তার জাত যাবে না। অন্য জাতে বাড়তি আসন পাতা হবে।''[১৪]

ক্ষেত্র গুপ্ত এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রায় দুহাজার গানের মধ্য থেকে একশটি গান নির্বাচন করেছেন। আর এই আলোচনায় তিনি বলেছেন যে তার এই সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের গান শ্রেণির কবিতার সামগ্রিক দিক চিহ্ন নয়। এ কেবল নির্বাচিত একশটি গানের আলাদা আলাদা ভাবে স্বাদ গ্রহণ ও কাব্য হিসেবে তার সমালোচনা। তবে লেখক আশা রেখেছেন এই কাজকে পরবর্তীরা এগিয়ে নিয়ে গেলে এ ধরনের চর্চার ভাণ্ডার আরো পরিপুষ্ট হবে।

শুরুটা 'কৈফিয়ত', হয়তো নয়, তবু তার কথাইতো, আর এই কথাতেই উঠে এসেছে যে বাঙালি কবিতা পাঠকদের দেড়শ বছরের অভ্যাস গানকে কবিতা হিসাবে পড়ার, আর তার আগে আট-নয়শ বছর ধরে কবিতাকে গান করে গাওয়া ও শোনা। উদাহরণ হিসাবে অবশ্যই চর্যাগীতি, বৈষ্ণব-পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালী ইত্যাদির নাম করা য়ায়। আসলে সেকালে গান ও কবিতায় ভেদাভেদ হয়নি, যা হয়েছে পরবর্তীকালে। লেখকের এই যুক্তি এতো অকাট্য যে এর সাথে দ্বিমত হবার সুযোগ নেই। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতিকবিতা প্রবন্ধে গানকে কবিতা বলে চিহ্নিত করেছেন, বৈষ্ণবপদাবলীও কীর্তনের আসরের বাইরে কাব্য হিসাবে ব্যাখ্যাত। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ পথের পথিক হয়েছেন। তাই লেখকের মত হল যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গানকে কবিতা হিসাবে পড়তে আমাদের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। লেখকের বক্তব্যে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের গায়কদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন তাঁর গানের কথাকে যেন অবহেলা করা না হয়, আর 'সঞ্চায়িতা'তে যখন কবি কিছু গানকে অন্তর্ভুক্ত করেন তখন এটাই স্বাভাবিক যে তাঁর এইটুকু ইচ্ছা ছিল যে তাঁর গানগুলিও কবিতার মতো পড়া হোক। এতো যুক্তির পরও লেখক সেই সম্ভাব্য প্রশ্নটি তুলেছেন অর্থাৎ গানকে কবিতার মতো পড়ার দরকার কী? কবিতার তো আর অভাব নেই। তবু লেখক মনে করেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর এক রকমের কবিতা, তা অনায়াসেই কাব্যের তালিকায় স্থান নিতে পারে। লেখক বলেন,

''গীতিকবিতা বা লিরিক, গাথা কবিতা বা কাহিনি কাব্য,

সনেট, দ্বিপদী-চতুষ্পদী (কণিকা, স্ফুলিঙ্গ)-এই বৈচিত্র্যের মধ্যে 'গান' আর একটি বর্গ বলে স্থান পেতে পারে। ... গীতিকবিতার জাতে হয়েও সনেট যেমন চিহ্নিত রূপে ও স্বাদে, গানের বেলাতেও তেমনি সুযোগ রয়েছে। ... কবিতা পড়ার সময়ে শব্দ, শব্দ বিন্যাস, চিত্রকল্প, ছন্দ ও মিল পাঠকের বিবেচনার বিষয় হয়। ... তাই ভালো পাঠক এবং ভালো গান হলে বার বার পড়তে হয়। এখানে সে একা, তার মনন মনের নির্জনে। তার এবং গানের মধ্যে সুর-গায়ক নামক কোনো দোভাষী নেই। কবিতা (এবং গানের) পাঠ বুদ্ধির চর্বন। যখন যেখানে আবেগে উত্তরণ তাও বুদ্ধিকে খাজনা দিয়ে। ... রবীন্দ্রের বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শুনবার সময় যথার্থ রসিক ও বোদ্ধারা কথাশ্রয়ী বিচিত্র সূক্ষ্ম কাজ অনাবশ্যক বোধে লক্ষ্য করেন না, সুরের যাদু শব্দের মন্ত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাতে সঙ্গীতের কোন ক্ষতি হয়ত নেই। কিন্তু কবিতার নিবিষ্ট পাঠক সেসব কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিবদিতচিত্ত। তিনি তাই গানশোনার থেকে পৃথক কিছু পান।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের গান কবিতারূপে গণ্য হলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হবে বলে লেখক আশা করেন।

গ্রন্থে লেখকের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি যেভাবে অন্য কবিদের কবিতা পড়া হয় সেভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি এই তিন পর্যায়ের গানই লেখক নির্বাচন করেছেন। লেখক গানগুলো যেভাবে

পড়েছেন তা মোটেই রবীন্দ্র গানের পাঠক্রমে যারা পরীক্ষা দেন তাদের পঠিত বইয়ের মতো ব্যাখ্যা হয়নি, হয়ে উঠেছে মননশীল বিশ্লেষণ। প্রত্যেকটি গান পড়তে গিয়ে লেখক ভুলে গেছেন এগুলো গান, শুধু মনে রেখেছেন এগুলো কবিতা। একশটি গানের সম্পূর্ণ পাঠের একটি করে শিরোনামও লেখক যুক্ত করেছেন।

গ্রন্থে উল্লিখিত প্রথম গানটির উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' গানকে তিনি 'অনন্ত তৃষ্ণার গান' শিরোনামে আখ্যায়িত করেছেন। গানটির ভাব ও রূপ বিশ্লেষণে লেখক দেখিয়েছেন যে গানটিতে 'আরো' শব্দের আঠারো বার ব্যবহার হয়েছে, যা গান শুনবার সময় বারে বারে 'আরো'র সুরে সমর্পিত উচ্চারণে কবির অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু, কবিতা হিসাবে দেখলে 'আরো' শব্দটি নিরীহ—তার ধ্বনিতে কোথাও জোর নেই, বাজনাও বাজে না। তবু শব্দের বার বার ব্যবহারে তা বোধের সাথে ঘর পেতে হয়ে উঠেছে অফুরন্ত। এইখানে কবিতার ব্যবহারে সে সার্থক। একশটি গানকেই লেখক এভাবে কবিতা করে পড়েছেন এই গ্রন্থে। অন্তে 'প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি' অধ্যায়ে লেখক তাঁর বিশ্লেষণের ধারাকে অনুসরণ করে একটি মোক্ষম উক্তি করেছেন। সেটি হল,

> ''বহু উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ভালো কবিতা নয়, আবার ভালো কবিতা হলেও তা সেরা সঙ্গীত হয়ে ওঠেনি।''[১৬]

তবে লেখকের মতে সব দিয়ে সুয়েও সেরা জিনিস রবীন্দ্রনাথ গানে এত বেশি যে এই গানকে কবিতারূপে পাঠকের পাওয়াও এক চরমপ্রাপ্তি। গানকে লেখক গীতিকবিতা হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান অন্যান্য কবিতার পাশে। লেখকের মতে গীতিকবিতার পরিবারে সনেটের যেমন রূপ ও স্বাদঘটিত একটা বিশিষ্টতা আছে, তেমনি আছে এ গানেরও, যা অবশ্য প্রায় অনাবিস্কৃত। লেখক বলেন,

> ''চরণ মধ্য মিল, চরণান্তিক মিল-তার মধ্যে কত ভিন্নতা

আনা যায়, তার প্রদর্শনী যেমন রবীন্দ্রগান। তাঁর অন্য জাতীয় কোনো কবিতায় এত বেশি এ ধরনের মিলের বাজনা বাজানো হয়নি। ... ধ্বনি বা নানা ধরনের শব্দ ঘটিত আওয়াজকে কাজে লাগিয়ে সুরের ধারায় বিভিন্ন রকমের বাজনা বাজিয়ে শ্রুতিতে ধাক্কা দিতে চেয়েছেন। গানকে কবিতা বলে পড়ার সময় এই কলরোল-ঝঞ্জনা নিক্কণ-নিনাদ একটা বাড়তি আবেদনে শোনাকে প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত ও প্রশান্ত করে। ... রবীন্দ্রের গানে ভাষার মন্ত্রে সর্বদাই একটা দূরের ডাক, এক অজানার রহস্য, অস্পষ্টতা, ইন্দ্রিয় আবেদনের বাস্তবতাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া। সব রঙের, গল্পের, প্রেমের, ফুলের, ঋতুর কাঁধে ডানা জুড়ে দিয়েছেন তিনি। পথ ও পথিক, নদীর স্রোত, বাতাসের বেগ, নৌকোর চলা, আর সময়—যে নিত্যযাত্রার চরম প্রতীক—এরা গানের কথাকে গতি দিয়েছে, দূরযানী করে তুলেছে। তাঁর সঙ্গীতে সে কাজ করেছে সুরের মায়া।”[১৭]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর মূল্যায়নের ভাবনা চিন্তা নিয়ে লেখকের এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার জগতে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা, যা রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর গভীরতা উপলব্ধির পথে আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে এবং সুরহীন কবিতারূপে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর তাৎপর্য, সৌন্দর্য, গঠনশৈলী ও সার্বিক নান্দনিকতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

।। চার।।

ড. মৌসুমী পালের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ঃ এক শতকের ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে। আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক সিতাংশু রায়। গ্রন্থে সূচিপত্রে রয়েছে— রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ গোড়ার কথা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ ভাষা ও ছন্দ, স্বরলিপি জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ চর্চা-প্রচার-শিক্ষণ, গান নিয়ে আরও ভাবনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পর্যায় ভেদ।

এই গ্রন্থে মূল ছয়টি অধ্যায় জুড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত প্রায় ছয়টি দশক জুড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক নানা ধরনের আলোচনা, চিন্তা—যা প্রবন্ধ, গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে ভিত্তি করে ছয়টি বিষয় ভাবনায় বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে নানা জনের নানা আলোচনা, বক্তব্য, মতামতের পর্যালোচনা সমালোচনা, সমীক্ষা করেছেন ড. পাল। এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ। বিশিষ্ট থেকে সাধারণ, খ্যাতনামা থেকে নামহীন সকলের ভাবনাকেই ঠাঁই দিয়েছেন গবেষক তাঁর পর্যালোচনায়। প্রতিটি বিষয়েই গবেষক অন্যদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের মিল, অমিল দেখিয়েছেন। আবার কোথাও আলোচকদের ভাবনাকে জোরালো কণ্ঠে সমালোচনাও করেছেন। একই বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের ভাবনাকে কারা কারা আত্মসাৎ করেছেন, তাও তিনি প্রহরীর কড়া দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ গোড়ার কথা' অধ্যায়ে বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৃষ্টির ইতিবৃত্তকে নানাজনের ভাবনা থেকে মূল্যায়ন করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিবর্তন তথা ক্রমবিকাশকেও পর্যালোচনা করেছেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে। তাঁর মতে,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশ ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। তারপর থেকে আজ অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনায় যাঁরাই অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবনের প্রথম পর্ব, ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ব্যক্তির, সঙ্গীতগুণীর, সঙ্গীত শিক্ষকের প্রভাব এইসব নিয়ে যথাসম্ভব, যথাতথ্য ও যথাসাধ্য আলোচনা করেছেন। ... এছাড়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' ও প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' গ্রন্থগুলি থেকেও একালের জিজ্ঞাসু পাঠক এবং শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবনের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এঁদের আলোচনা সর্বাঙ্গীণ, তথ্যনিষ্ঠ ও সুবিস্তৃত বলে এই বিষয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধে নবতর তথ্য বা নতুন কোনো সংবাদ প্রায় দুর্লভ।''[১৮]

গবেষকের অভিমত হলো রবীন্দ্র সমকালীনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁদের পারস্পরিক সাংগীতিক সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনাও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। তাঁর মতে, এ বিষয়ে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ, এবং এই পর্যায়ে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখক। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য আরো সব লেখকদেরও প্রশংসা করেছেন ড. পাল। তাঁর মতে সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ' একটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ। তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় বিবর্তনের রেখাচিত্র এখনও তেমনভাবে আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয়নি। তবে এ বিষয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান' গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান সংযোজন। তাঁর অভিমত হলো, গীতাঞ্জলির সুরারোপিত গানগুলিকে গীতাঞ্জলি পর্বের গানরূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি প্রফুল্লকুমার দাসের 'গীতাঞ্জলি গান' প্রবন্ধটিকেই আলোচনার ইতিহাসে বিশদ আলোচনা বলে মনে করেন। গবেষকের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের গানের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর 'বাংলা কাব্য সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থটি। এছাড়া সুধাংশুশেখর শাসমলের 'ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থকেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষাগত বিশ্লেষণের দিক থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হলো প্রগলভ গ্রন্থটির সমগ্রের এক চতুথাংশেই লেখক তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন। তাঁর কাছে ধরা পড়ে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে ছন্দ ও তালের আলোচনা থাকলেও সে আলোচনা নিছক তালের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। প্রায় সকলেই গানের ছন্দ বলতে তালকেই ব্যবহার করেছেন, ছন্দ ও তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু উদ্ধৃতি প্রায় সকলেই নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন, কোন তালে কবি কী কী গান বেঁধেছেন তার তালিকা, কবি সৃষ্ট নতুন তালের বোল শিক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরেছেন, তার বেশি কিছু নয়। গবেষকের মতে রাজ্যেশ্বর মিত্র 'ভারতীয় সঙ্গীতে ছন্দচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দের মূলতত্ত্ব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, আর প্রফুল্ল কুমার দাস 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধে এবং অমিয়মুকুল দে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছন্দ তথা তালের প্রয়োগ পদ্ধতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তাল ও ছন্দের অতি সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ

দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগের ব্যবহার নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সুধীর চন্দ-র 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঙ্ম রাগ-সুর নির্দেশিকা' গ্রন্থটিকে তিনি প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি'র পর অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে মনে করেন, এছাড়া অমলকুমার মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত রাগসঙ্গীত'কে ভাঙাগানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত আকর গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক সিতাংশু রায়ের 'হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন' প্রবন্ধটিকে তিনি একটি মননশীল প্রাজ্ঞ আলোচনা বলে মনে করেন, যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের নন্দন তত্ত্ব বিষয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিলাতি সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে বহু আলোচনার মধ্যে গবেষকের মতে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতায়ণ' গ্রন্থে সংকলিত ভাস্কর মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত' এই প্রসঙ্গে একমাত্র রচনা, যা বিশেষজ্ঞর চিন্তায় সমৃদ্ধ। এছাড়া অনুরাধা পালচৌধুরীর 'বিলাতী গান ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থটিও তাঁর মতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনাগুলি অধিকাংশই অত্যুক্তি দোষদুষ্ট বলে তিনি মনে করেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ লোকসঙ্গীত বলতে 'বাউল' প্রভাবকে মনে করেন, অথচ কীর্তন ও বাউল মিশ্রিত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে লৌকিক উপাদান সঞ্চার করেছে এই বিজ্ঞানসম্মত বোধটি অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। ড. মৌসুমী পালের কাছে ধরা দেয় ,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার বিস্তৃত এলাকার একটি বড় জমি গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের বেড়া দিয়ে ঘেরা। অবশ্য বেড়া মজবুত নয়। মাঝে মাঝে ভেঙেও পড়ে। তাই মায়ারখেলার গান ও প্রেমের গান একাকার হয়ে যায়। নৃত্যনাট্যের গানও

বিষয়ের দাবিতে প্রেমের বা প্রকৃতির আসরে ঢুকে পড়ে।"[১৯]

শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে কবির নৃত্যনাট্য রচনার ইতিহাসের সঙ্গে স্বয়ং গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের আলোচনা সর্বাধিক তথ্য নিষ্ঠ, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে পথনির্দেশক। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

> ''সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে নৃত্যনাট্যের গভীরে প্রবেশ করে সেগুলির নায়িকা চরিত্রের বিশ্লেষণ করে প্রেম ও তার দার্শনিক স্বরূপ সম্পর্কে অসাধারণ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থে আবুসয়ীদ আইয়ূব। আবার সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আলো আঁধারের সেতু ঃ রবীন্দ্র চিত্রকল্প' গ্রন্থে নৃত্যনাট্যের সংলাপে কাব্য-সৌন্দর্য আলোচনা করেছেন। এই ধরনের আলোচনা পূর্ব উল্লিখিত, প্রচলিত, পরীক্ষা পারঘাটের খেয়া জাতীয় গ্রন্থ নয়।"[২০]

একই ভাবে স্বরলিপি জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ চর্চা প্রসার শিক্ষণ, গান নিয়ে আরও ভাবনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পর্যায় ভেদ সবকটি অধ্যায়েই লেখক সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের বিষয়ভিত্তিক তথ্য সম্বলিত আলোচনা ও ভাবনার অবতারনায় বিভিন্নজনের বক্তব্যের পাশাপাশি নিজের অভিমত প্রকাশ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আগামী দিনের গবেষকদের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক নানা দিকের তথ্য ও সঠিক পথের সন্ধান প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক বিচিত্র প্রবন্ধ মালা আর গ্রন্থাদির উল্লেখের মাধ্যমে ডঃ পাল গবেষকদের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ নির্বাচন আর গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন।

।। পাঁচ।।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী-শিক্ষিকা, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য ছাত্রী শ্রীমতী স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়ে-র 'রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গের গান' নামক ছোট গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। এই গ্রন্থে মোট দশটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে আলোচনার নানা পর্বকে। নিবেদনের লেখনীতে তিনি জানিয়েছেন যে 'মিলেমিশে' পত্রিকায় তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধেরই সম্প্রসারিত রূপ নিয়েছে এই গ্রন্থ। শিরোনামহীন দশটি ভাগে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা, সাংগীতিক বিকাশ, বাংলায় কীর্তনের সূচনা-বিবর্তন-প্রকারভেদ ইত্যাদি আলোচনা ধারার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রগানে কীর্তনের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি যুক্তি শৃঙ্খলার পারম্পর্যে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ধর্ম থেকে ধর্মতন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন করতে শিখিয়েছেন বাঙালিকে। রবীন্দ্র জীবনদর্শনে ধর্মভাবনা পর্ব থেকে পর্বান্তরে মনুষ্যধর্মের অভিমুখী হয়েছে। মানুষের ধর্মই রবীন্দ্রনাথের আজীবন আরাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকার রূপে খ্যাতি অতি অল্প বয়সেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সঙ্গীত স্রষ্টা হিসাবে তাঁর সৃষ্টির লীলা চলেছে আমৃত্যু। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো,

> ''রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে দরবারি সঙ্গীতের তানের মর্মান্তিক প্রাণহীন প্রলাপের ও তালের তাণ্ডব থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি ভাবকে মেনেছেন গানের উপকরন হিসেবে, সুরকেও লঘু করেননি, তাকে করেছেন অনির্বচনীয়। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে মানবধর্মী ও ব্যক্তিধর্মী করেছেন, রাজ দরবার থেকে সাধারণ মানুষের দাওয়ায় স্থান পেতে দিয়েছেন। ...

তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন বাংলা তথা ভারতীয় লোকসুর ও লোকগানের ভাব ও ভাষার অবয়ব। গ্রহণ করেছেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ কীর্তন, যে কীর্তন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পা ছুঁয়ে লীলার মাহাত্ম্যে বাংলার প্রাণের একান্ত সম্পদ হয়ে উঠেছিল ভাবরসে ও জীবন যাপনে। কীর্তন শুধু একটি গীতধারা নয়, এটি বাংলার ভাব আন্দোলন, যা বাংলার বন্ধ্যা জীবনে প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল, ভেঙে দিয়েছিল জাতপাতের জলচল অচল সমাজ বিন্যাসের কৃত্রিম থাকগুলো। ... বাউল ও কীর্তন গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক গুরুত্ব ও এক বিশেষ মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন।"[২১]

কীর্তনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাব ধারার উল্লেখে গবেষকের মতামত হল, চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদের প্রভাবে বাংলার ভাষা, কাব্য, দর্শন চিন্তা, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল, যা সৃষ্টির জগতে নবীন ও অনেকক্ষেত্রে অভূতপূর্ব, আর বাঙালির সংস্কৃতির শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণ ঘটল। কীর্তনের প্রকারভেদ বা ঘরানা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন যে, কীর্তনের উন্নতমানের রূপটি গরানহাটি ধারার মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে। কীর্তনের পাশাপাশি বাউল প্রভাব কবির গভীর অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল, স্বীকরণও করেছিলেন কবি অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথ বাউলের মন্ত্রহীন সহজ আনন্দ ও মুক্তি দিয়ে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের সঙ্গে কবির নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সঙ্গে যখন মিশেছেন তখন অবশ্যই গ্রামীণ কথক ও কীর্তনিয়াদের সঙ্গেও

তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, বৈরাগী বোষ্টম বোষ্টমীদের ভোর কীর্তন শুনে তাঁর পদ্মাপারের জীবনে অনেকদিনই ঘুম ভেঙেছে বলে তাঁর অনুমান। এছাড়া যশোরের বিখ্যাত কীর্তনিয়া মধুকানের পালা শৈশবে শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ, যার দ্বারা তিনি হয়ত প্রভাবিতও হয়েছিলেন। তাঁর মতে বাউলাঙ্গ ধারার পূর্বে কীর্তনাঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। প্রথম কীর্তনাঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতটি হল 'সারা বরষ দেখি নে মা' যা ১৮৮১ তে রচিত আর কীর্তনাঙ্গে শেষ গান 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘনদিন' রচিত হয় ১৯৪০-এ। তবে আখরযুক্ত কীর্তনাঙ্গ গান হিসাবে 'আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি' গানটিই প্রথম রচনা ১৯৮৫ সালে যা রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ ধারার ষষ্ঠ গান। গবেষকের বিচারে সারা জীবনে অন্তত ২০৪টি কীর্তনাশ্রয়ী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে বিশুদ্ধ কীর্তন ধারার পাশাপাশি বাউল, সারি, রাগরাগিনীর মিশ্রণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে,

> ''এছাড়াও ভাবতে হবে 'ভানু সিংহের পদাবলী'র কথা। ... মৈথিলি ভাষার অনুসরণে প্রথম জীবনের এই পদগুলিকে রাগরাগিনীর কোঠায় রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা সরিয়ে রাখলেও এই সব পদের সুর কীর্তনাঙ্গে নিবন্ধ এ দাবি উপেক্ষা করা যায় কি? ... কেন না গানগুলি কীর্তনের বিষয়, ভাব ও সুরে আধারিত।''[২২]

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বাংলার বৈষ্ণব পণ্ডিতদের বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আপ্লুত করেছিল। বৈষ্ণব সাধকদের মতে অনেক গানেই কবি বৈষ্ণবদের অন্তরের কথা বলেছেন, বৈষ্ণবদের সাধনরূপ তাঁর কবিতা ও গানে বিপুল পরিমাণে রয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের গৌরবের গুরুভার মেনে নিতে চাননি, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর

ক্রমশ মানুষের ধর্মে আশ্রয় নিতে শুরু করেছিলেন, যা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভজনসঙ্গীত রচনায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কীর্তনে রবীন্দ্রনাথ শুধু সুরের অভিনবত্ব বা দেশজ উপাদান পেয়েছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে উন্নত সাহিত্যগুণও লক্ষ করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসৃষ্ট কীর্তনে তালের জটিলতা কম, প্রচলিত তালই এখানে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে তালের 'মাতান' অংশ রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মার্গীয় রাগকে অবিরাম মিশিয়েছেন কীর্তনের দেশজ সুরের সাথে। সুর তাল লয়ের এমন এক সুসমঞ্জস রূপ রবীন্দ্রকীর্তনে রয়েছে, যা সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়ের প্রদেয় তথ্য থেকে জানা যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রথমদিকে ধ্রুপদাঙ্গ সুরেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরে এখানেও কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এর মূলেও হয়তো রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানের অপূর্ব মাহাত্ম্য কাজ করেছিল। বাউল ও কীর্তনের মিশ্রণে সৃষ্ট 'বাংলার মাটি বাংলার জল' বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের রাখী বন্ধন পদযাত্রার এই গানটিকে শ্রীচৈতন্য পরিকল্পিত নগরকীর্তনের সাথে তুলনা করেছেন লেখক। বিভিন্ন নাট্য-নাটকে কীর্তনের 'বহুশাখায়িত নাট্যরস'কেও রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রগানে 'কথার তান' অর্থাৎ আখরযুক্ত কীর্তনের স্বল্পতা থাকলেও তাঁর মতে মাত্র ছয়টি এ ধরনের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাণ্ডারের অমূল্যধন। কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নরীতি সম্বন্ধে গবেষকের বক্তব্য এই যে, গানগুলির যথার্থ ভাব প্রকাশে সুরে কথায় তালে গাইবার সময় গানের কথার মাঝে মাঝে যথাযথ যতি ব্যবহার করলেই গানগুলি যথার্থ পরিবেশন করা সম্ভব। কয়েকটি গানের ছন্দোভাগ করে তিনি বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন। বলেছেন,

> ''রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ করে কীর্তন গানে কাব্য ও সঙ্গীতের এক মহামিলন ঘটেছে, গায়ককে সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে এই কাব্য মাধুর্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে হবে,

অন্যথায় পরিবেশন সুষ্ঠু হবে না।”[২৩]

রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থমালায় স্বল্প পরিসরে লিখিত কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়টির একটি প্রামান্য ধারণা পেতে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় সহায়তা করছে এবং করবেও।

।। ছয়।।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থের আলোচনা সমীক্ষার পথে আমাদের নির্বাচিত শেষ গ্রন্থটি রবীন্দ্রজন্মসার্ধশতবর্ষের লগ্নে প্রকাশিত ড. পপি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাস’। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১০ সালের মে মাসে। আলোচ্য গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে—আত্মকথন, প্রথম অধ্যায়—রবীন্দ্র সমকালীন রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনা ঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশক, দ্বিতীয় অধ্যায়—রবীন্দ্র-পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনা ঃ চল্লিশের দশক, পঞ্চাশের দশক, ষাটের দশক, সত্তরের দশক, আশির দশক, নব্বই-এর দশক। তৃতীয় অধ্যায়—রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনামূলক গ্রন্থের শ্রেণিবিন্যাস, গ্রন্থপঞ্জি, প্রবন্ধপঞ্জি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা সমালোচনার ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। অথচ এসব গবেষণা, সমালোচনা নিয়ে তথ্যানুভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ণ বিশেষ করা হয়নি। গবেষক তাঁর গবেষণায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক সমালোচনা, আলোচনা গ্রন্থ এবং নিবন্ধের তথ্যভিত্তিক অন্তর্মূল্যায়ন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন নিবন্ধীকরণ করেছেন দশকভিত্তিক

সমালোচনাকে একত্র করে। বিশশতকের সূচনা পর্ব অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবিত কাল থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থস্বত্বলোপের পূর্ব পর্যন্ত একশো বছরের সময়কালে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে, এই সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুচ্ছকে দশকের বিচারে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্র সমকালীন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনাকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে—বিংশশতকের প্রথম দশক (১৯০০-১৯০৯), দ্বিতীয় দশক (১৯১০-১৯১৯), তৃতীয় দশক (১৯২০-১৯২৯), চতুর্থ দশক (১৯৩০-১৯৩৯)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনাকে ছয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে—চল্লিশের দশক (১৯৪০-১৯৪৯), পঞ্চাশের দশক (১৯৫০-১৯৫৯), ষাটের দশক (১৯৬০-১৯৬৯), সত্তরের দশক (১৯৭০-১৯৭৯), আশির দশক (১৯৮০-১৯৮৯), নব্বই-এর দশক (১৯৯০-১৯৯৯)। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখিকা কথাশ্রয়ী, সুরাশ্রয়ী ও তত্ত্বাশ্রয়ী এই বিন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনামূলক গ্রন্থের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। কথাশ্রয়ী আলোচনার বিষয়কে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা বা বাণীর তাৎপর্য', 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঙ্গীত অর্থাৎ কবিতা গানে বাণীর তাৎপর্য', 'নাট্যসঙ্গীতে বা নাটকের গানে কথা বা বাণীর তাৎপর্য', 'রবীন্দ্র-গীতিনাট্যে ও নৃত্য নাট্যে বাণীর তাৎপর্য', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিত্রকল্প বিষয়ক আলোচনা'—এই ছয়টি পর্বে বিভক্ত করে বিভিন্ন জনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

সুরাশ্রয়ী সমালোচনাকে গবেষক চারভাগে বিভক্ত করে নানাজনের মতামতকে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিষয়ক আলোচনার পর্বগুলি হল—'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও ছন্দ', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কী'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্বাশ্রয়ী

আলোচনায় বিদগ্ধ রবীন্দ্র সমালোচকদের গভীর বিশ্লেষণকে লেখিকা পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন—'রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুঃখ ও বিরহের পর্যালোচনা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'আনন্দ' তত্ত্বের আলোচনা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'সুন্দর' তত্ত্বের পর্যালোচনা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'মৃত্যুর রূপ' সম্পর্কে আলোচনা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'মুক্তি' তত্ত্বের আলোচনা।' তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনায় শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনা গ্রন্থগুলিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> ''বিংশ শতকের সূচনা পর্ব থেকে রবীন্দ্র-গ্রন্থস্বত্বলোপের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একশো বছরের ইতিহাসের পর্যালোচনায় প্রত্যক্ষীভূত হয় কিভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনার ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর মতো বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের মসীবর্ষণের তীক্ষ্ণতায় জর্জরিত হয়ে পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনার ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ... বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর এবং তাল সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা প্রত্যক্ষ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা এবং ভাব সম্বন্ধে তেমন কোনো সমালোচনা দেখা যায়নি। যদিও এই সময়ে মার্গসঙ্গীতের বিশিষ্ট গায়ক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে মন্তব্য রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাসে অন্য মাত্রা এনে দেয়। তিনি মন্তব্য করেন... 'কবি এমন কোনো সুরের সঙ্গে এমন কোনো প্রতিকূল অর্থাৎ বেখাপ্পা সুর

মেশাননি যার ফলে সঙ্গীত অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। ... রবিবাবু ওস্তাদ নন, কিন্তু কবি ও আর্টিস্ট। ... তিনি অসাধারণ, তার মানে সাধারণের কান তো তাঁর আছেই, উপরন্তু আরো কিছু তাঁর আছে। ... রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়।"[২৪]

রবীন্দ্রপ্রয়াণপরবর্তী সময়কালের গ্রন্থগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সমালোচকরা নানা দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দেখেছেন। এই সমস্ত সমালোচকদের মধ্যে একদিকে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, শিক্ষক, শ্রোতা, গবেষক রয়েছেন, অপরদিকে তেমনি বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের মননশীল লেখনীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচনার ইতিহাসকে ঋদ্ধ করেছেন। বিংশ শতকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বেশ কিছু সমালোচকের মৌলিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে, যা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই শতকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমালোচকরা তাঁদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথায় তাৎপর্য, সুরের বৈচিত্র্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার ভাবের মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্বকে খুঁজে পেয়েছেন।

গবেষক মনে করেন যে, বিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের কিছু সমালোচনা বিরুদ্ধবাদী হলেও সমগ্র শতকের হিসাবে অধিকাংশ সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে যে কথা, সুর ও ভাবের মেলবন্ধন ঘটেছে এবং কবির বিভিন্ন রচনায় যে আত্মীকরণ ঘটেছে তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিংশ শতকের রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনায় তাত্ত্বিক ভাবনা সত্তরের দশক থেকে শতকের শেষার্দ্ধে বেশি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর-তাল-লয় যেমন পারস্পরিকভাবে যুক্ত, তেমনি কথা ও

ভাব অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাত্ত্বিকতার বিশ্লেষণে এই ভাব ধারার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিত্বের আত্মীকরণ, মানবজীবনের বিভিন্ন ভাবের বিচ্ছুরণ। গবেষক আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত আরও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, আর নতুন প্রজন্মের সমালোচকরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হবেন।

এই গ্রন্থে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জি ও প্রবন্ধপঞ্জি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগীদের এক অসাধারণ প্রাপ্তি। এক শতকের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক প্রকাশনার যথার্থ দলিল রচনা করেছেন তিনি। আগামী দিনের গবেষকরা এই গ্রন্থে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার বিচিত্র ভাবনার ভাণ্ডার থেকে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনার ইতিবৃত্ত রচনায় গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেই এগোতে পারবেন।

সূত্রনির্দেশ—

১। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, রাগরাগিনীর এলাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, মে ২০১১, পৃঃ-৩-৪।

২। তদেব, পৃঃ-৪-৫-৬।

৩। তদেব, পৃঃ-৮।

৪। তদেব, পৃঃ-৮-৯।

৫। তদেব, পৃঃ-২০-২১।

৬। সুভাষ চৌধুরী, গীতবিতানের জগৎ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ-৩।

৭। তদেব, পৃঃ- ১১৩।

৮। তদেব, পৃঃ- ১৭০।

৯। তদেব, পৃঃ- ১৭০।

১০। তদেব, পৃঃ- ৫১৩।

১১। তদেব, পৃঃ- ৫৬৫।

১২। তদেব, পৃঃ- ৫৯৩।

১৩। তদেব, পৃঃ-৫৯৪-৬০১-৬০২।

১৪। ক্ষেত্রগুপ্ত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ শব্দের মন্ত্র, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২৯শে ফাধন ১৪১৭, নিবেদন পৃষ্ঠাঙ্ক নেই।

১৫। তদেব, পৃঃ-৩।

১৬। তদেব, পৃঃ- ৯৬।

১৭। তদেব, পৃঃ- ৯৭-৯৯।

১৮। মৌসুমী পাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চা ঃ এক শতকের ইতিহাস, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা ২২ শ্রাবণ ১৪১৩, পৃঃ-১৩-১৪।

১৯। তদেব, পৃঃ- ৭৯।

২০। তদেব, পৃঃ- ৮১।

২১। স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গের গান, একুশশতক, কলকাতা, জুলাই ২০০৯, পৃঃ-১৩-১৪।

২২। তদেব, পৃঃ- ২৫-২৬।

২৩। তদেব, পৃঃ- ৪৩।

২৪। ড. পপি বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার ইতিহাস, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, মে ২০১০, পৃঃ-৩-৪।